রামকিঙ্কর -এর জীবন ও শিল্পদর্শন

বিপ্লব মাঝি

শিল্পের সাধক যাঁরা সাধনার পথে বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন মানসিক শক্তির জোরে। তাঁরা ভালোই জানেন ছদ্মবেশী কুহেলিকা স্বাধীন মানসিকতাকে বিপথে চালিত করে। এ-রকম প্রাজ্ঞ, স্বাধীন মানসিতার শিল্পীদের জন্য চাই একটি শান্তিনিকেতন। সেই শান্তিনিকেতন রামকিঙ্কর বেইজ পেয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকে রামকিঙ্করের একটা স্বপ্ন ছিল : '—যেখান দিয়ে যাব রাস্তার ধারে ধারে মূর্তি রচনা করে চলব। সূর্যের আলো, চাঁদের আলো, বর্ষণাতুর আকাশের তলায় বড় মূর্তি দেখতে ভালো লাগে।' আজীবন, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই ব্রতে ব্রতী ছিলেন। নিজের গরিবি নিয়ে তাঁর মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। তিনি জানেন, 'শিল্পীরা স্বভাবতই গরিব হয়ে থাকেন, 'শিল্পের সাধনাই তাদের গরিব করে রাখে। কিন্তু রসিক বিদ্বৎজ্জনের দেখাও তারা পান। যেমন রামকিঙ্কর পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের। পেয়েছিলেন বলেই নিশ্চয় মূর্তিগুলো সঞ্জীবিত করার নির্বাক সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের সেদিনকার সৃষ্টির উৎসবের আবহের স্পর্শ দূরদর্শনে উপলব্ধি করতে হলে রামকিঙ্কর বেইজের মতো শিল্পীদের রচনা, বক্তৃতা, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা আমাদের পাথেয়। স্মৃতিকথা, সাক্ষাৎকার শিল্পীর শিল্পকলাকে বুঝতে সাহায্য করে। রামকিঙ্কর নিজেও বলেছেন : 'আমার আর কী বলার থাকতে পারে। আমি তো শাব্দিক নই, আমি চাক্ষিক। বলতে গেলেই সব এলোমেলো হয়ে যায়। গুছিয়ে - গাছিয়ে আমার পক্ষে নিজের কথা বলা খুবই মুশকিলের ব্যাপার। আমাদের পরিচয় কাজের মধ্য দিয়ে। সবাই যদি কাজগুলি দেখেন তো কাজ হয়।'

রবীন্দ্রনাথ রামকিঙ্করের অন্যতম প্রেরণা। তিনি দেখেছেন বাণী - সুর - শব্দ নিয়ে অজস্রধারে কাজ করলেও রবীন্দ্রনাথ অপরূপ রং - রেখার প্রাচুর্য নিয়ে টানা দশবছর নির্বাক মগ্নতায় কাটিয়েছেন। রামকিঙ্করের অন্য প্রেরণাটি হল প্রকৃতি। নারী আর পুরুষ এবং শিশুকে নিয়ে প্রকৃতির যে জন্ম - মৃত্যু, আনন্দ, সৌন্দর্যের খেলার থিম - রামকিঙ্করের অদ্ভুত সুন্দর মনে হয়েছে। প্রকৃতির এই লীলাকেই তিনি রং - রেখা আর ভাস্কর্যের ফর্মে ধরতে চেয়েছেন। এই ফর্মই সিম্বল। সর্বত্রই এই সিম্বলকে সংগীতে - চিত্রকলায় - শিল্প সাহিত্যে ধরে রাখার খেলা।

রামকিঙ্কর প্রচার বিমুখ। প্রচার শিল্পীর ক্ষতি করছে, তার সাধনায় ক্ষতি করছে। প্রচারে প্রচারে ঝালাপালা কান, মেশিনের গোলমাল। রামকিঙ্কর তথ্যপ্রযুক্তির বিস্ফোরণ দেখে যাননি, রামকিঙ্কর গ্লোবালাইজেশনের লীলাখেলা দেখে যাননি, দেখেননি বিজ্ঞাপনে কীভাবে ঢেকে যাচ্ছে অশিল্পীদের মুখ। পণ্য সর্বস্ব এই পৃথিবীর শিল্পদূষণ রামকিঙ্কর দেখে যাননি। তবু তাঁর মনে হয়েছে 'এতই যদি মেশিনের যুগ, এবার সাইলেন্সের-এর যুগ কবে আসবে, তারই আশায় রইলাম। আজও যাঁরা শিল্পের প্রকৃত সাধক - তাঁরা স্তব্ধতারই সাধনা করেন। তিনি বলেছেন, 'আমি চাক্ষিক, রূপকার মাত্র।' রূপকারের কাছে শব্দের কোন অর্থ নেই। রামকিঙ্কর শাব্দিক নন। রূপ অপরূপ হয়ে ওঠ স্তব্ধতায়। রামকিঙ্কর স্তব্ধতা ভালোবাসেন।

।।দুই।।

রামকিঙ্করকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাঁর সময়ে শিল্পীদের মূল সমস্যা কী ছিল? উত্তরে বলেছিলেন 'আমি যদি ছবি আঁকতে পারি...তাহলে কোন সমস্যাই নেই।' আর বর্তমান শিল্পীদের মূল সমস্যা কী? রামকিঙ্কর বলেন কাজ করার স্বাধীনতা ও ইচ্ছা। বিয়ে না করলেও তিনি মনে করেন, ঘরবাঁধার সুখ শিল্পের কাছেই মিটে যায়। জীবনে নারীর প্রয়োজন আছে, কারণ পুরুষ প্রকৃতির সৃষ্টি। মানুষ প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির লীলা-র ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। ঈশ্বর যদি প্রকৃতিকে নিয়ে খেলেন, মানুষ কেন খেলাবে না? অতএব পিকাসো কথিত 'প্রকৃতিকে পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে শিল্পী তাকে অপমানই করে'—এ বচন তিনি মানেন না। রামকিঙ্করের কাছে প্রকৃতি মায়া। প্রকৃতিতে মায়ার খেলা চলে। প্রকৃতিতে যা আছে তার থেকে আনন্দ নাও। সৃষ্টি করো। শিশু জন্ম দেওয়া এক অর্থে পুনর্জন্ম সৃষ্টি করা।

কর্ম সক্রিয়তা ভালো লাগে রামকিঙ্করের। সক্রিয় জীবন ভালো লাগে। তিনি মনে করেন শিল্পী যা করেন সবই আত্মপ্রতিকৃতি। সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন খোলা মন আর অনুভূতি। যার মধ্যে পাগলামি থাকে, নেশা থাকে সেই সৃষ্টি করে। যে কোন সৃষ্টির পেছনে আনন্দ থাকা চাই। রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্পর্কে বলতেন : 'বাতিকগ্রস্ত, মাথা খারাপ।'

কোন কাজ একবারে শেষ হতে পারে, নাও হতে পারে। আসল হল ভালোলাগা। ভালো না লাগলে বদলাও, বদলাতে থাকো। রামকিঙ্কর মনে করেন যে কোন কাজের জন্য সর্বাগ্রে যেটা প্রয়োজন তা হল : 'ফিলিং ফর এভরিথিং।' অনুভূতি দুর্বল হলে নিরাশা আসে। শিল্পকাজের জন্য বলেন : 'আমি সেরকম ভিখারি নই।' তিনি যা চান—তাঁর শিল্পের কাছেই পেয়ে যান।

।।তিনি।।

১৯২৫, অসহযোগ আন্দোলনের সময় রামকিঙ্কর প্রথম শান্তিনিকেতন আসেন। নন্দলাল বসু তখন কলাভবনে অধ্যক্ষ। রামানন্দবাবু রামকিঙ্করকে নন্দলাল বসুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। প্রথম দেখায় নন্দলাল বসুকে তাঁর মনে হয়েছিল সাঁওতাল। তাঁর জল রং আর তেল গেছে। আর কী শিখবে?' তবু রামানন্দবাবুই শান্তিনিকেতনে তার ঠাঁই করে দেন।

রামকিঙ্কর নিজেই নিজের শিক্ষক ছিলেন। শান্তিনিকেতনে এসে দেখলেন নন্দলালকে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ : 'কারওকে কিছু শিখিও না, যে যা করতে চায় করুক।' নন্দলাল নিজেও নিজের কাজ করুন—যা দেখে ছাত্ররা শিখবে। প্রেরণা পাবে। রবীন্দ্রনাথ কেতাবি শিক্ষা পছন্দ করতেন না। তিনি চাইতেন প্রয়োগ পদ্ধতি শিক্ষা হোক স্বাভাবিকভাবে। তা যেন চাপিয়ে না দেওয়া হয়।

শান্তিনিকেতনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সবধরনের শিল্পকলাকে রামকিঙ্কররা আত্মস্থ করতেন স্বাধীনভাবে। বিভিন্ন শৈলীর সচেতনচর্চার প্রভাব সেখানে ছিল না।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ই বি হ্যাভেল -এর রিভাইভালিট আন্দোলন রামকিঙ্করদের প্রেরণা হয়ে ওঠে। ভারতশিল্পের পুনরুদ্ধারে তাঁরা মেতে ওঠেন। ঘরবাড়ি সাজানোর জন্য পোড়ামাটির জিনিসপত্র ব্যবহার শুরু হল। ভারতীয় রীতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরি হতে লাগল।

রামকিঙ্কর মনে করেন, শিল্পের চরিত্র বিশ্বজনীন—সেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সীমারেখা থাকতে পারে না। শিল্পের কোন সীমানা নেই। ভেদাভেদ নেই। তবে জাগতিক অনুভব আছে। বলেই শিল্পের প্রয়োগ পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। উপলব্ধির ক্ষমতা ও সংবেদনশীলতাই যে কোন প্রতিভার মূল। শিল্পী তা অর্জন করেন নিজের ভেতর থেকেই— বাইরে থেকে রোপণ করা যায় না। সবই শিল্পী একই পথে হাঁটেন, কিন্তু নিজের মতো এগিয়ে যান।

রবীন্দ্রনাথ, নন্দলালের মতো যাঁরা মহানশিল্পী তাঁদের কোন একটি কাজকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দেওয়া যায় না। মহান শিল্পীদের কাজেরর শীর্ষ খোঁজায় সমস্যা আছে।

।।চার।।

রামকিঙ্করকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : শিল্পে ভারতীয়তা বলে বিশেষ কোন ধর্ম আছে কি? রামকিঙ্করের উত্তর : 'আছে মনে হয়। কারণ খ্রিস্টধর্ম বৌদ্ধধর্মের থেকে আলাদা । খ্রিস্টানরা খ্রিস্টের ছবি আংকে, বৌদ্ধরা বুদ্ধের। কিন্তু কীকরব, মানুষের ধর্ম একই। খ্রিস্ট ভারতীয় বুদ্ধমূর্তির থেকে আলা। শিল্পী শিল্পীই, কিন্তু দেশজ ব্যাপারটা এসে যায়' যদিও শিল্পীর কাছে ভারতীয়তা বলে কিছু নেই। সব সমান।

রামকিঙ্কর মনে করেন ভারতীয় ভাস্কর্য লৌহিক হওয়া উচিত। তবে মন যেরকম চাইবে— সেইভাবে কাজ করা উচিত। ভারতীয় ভাস্কর্যের ঐতিহ্য প্রাচীন ও বিশাল তার কপি করা উচিত। যেমন তিনি আধুনিক ভাস্কর্যের উন্নত নিদর্শন 'যক্ষ - যক্ষী' করেছেন।

রামকিঙ্করের ভাস্কর্য ও চিত্রকলাকে সংগীত ও নাটক দ্বারা অনুপ্রাণিত। লালন ফকিরের গান থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছে। রামকিঙ্কর মনে করেন : ' ফ্যাকট নিয়ে কাজ হয় না। ঐ রকম ডেরিভেটিভ আমি নই। মানুষকে দেখে কাজ হয়' সুন্দরের সাধনায় তিনি বিশ্বাসী।

।।পাঁচ।।

রামকিঙ্করকে যখন জনৈক সাক্ষাৎকারী জিজ্ঞেস করেন চিত্র ও মূর্তি গড়ার মধ্যে কোনটা তিনি ভালোবাসেন? উত্তরে রামকিঙ্কর বলেন, : '...রং আর আলোর আনন্দ প্রকাশ করতে যখন মন চায়, আকাশ আর জলের খেলা, ফুল ও রূপমতী তরুণীর সৌন্দর্য যখন ব্যক্ত করতে চাই, তখন আমি হাত দিই রং আর চিত্রপটে

কিন্তু সূর্যাস্তের বিষণ্ণ রাগের অবসানে আমি চোখে পুজে। মধ্যরাত্রির অন্ধকারে যে শিশু কেঁদে ওঠে, তাকে তোষণ করতে হয়, তার গায়ে স্নেহের পরশ বোলাতে হয়। এই হল ভাস্কর্য এই গম্ভীর প্রকাশ আত্যান্তিক আপন ও গভীর। রং নেই, আলোছায়ার খেলা নেই। আছে শুধু প্রাণশক্তির চেতনা। এর গরিমা রঙের সীমা অতিক্রম করে রূপ নেয় কঠিন সত্যের মধ্যে দিয়ে মাতৃগর্ভে সদ্যজাত শিশুর মতো। এসই ভাবের প্রেরণায় আকাশতলে ছড়িয়ে দিই ভাবনার প্রতিমূর্তি।' তাঁর মতে আধারে রক্তমংসে গড়া যে-মূর্তির অনুভূতি তাকে পাথরে রূপ দেওয়াই ভাস্করের কাজ।

আধুমিক যুগে ভালো নিদর্শন তৈরি হচ্ছে না, রামকিঙ্কর মনে করেন তার কারণ, এ যুগের সভ্যতা গতিময়। পায়ের নিচে মাটি নেই । প্রাচীন যুগের মতো ধর্মে আমাদের মতি নেই। সবকিছুই অপসরণশীল। কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা বিশাল কিছু সৃষ্টি করতে চাই। তাই ভালো ভাস্কর্য নিদর্শন নেই।

।।ছয়।।

রাজনীতি সম্পর্কে রামকিঙ্করের মূল্যায়ন কী? তিনি বলেন : 'কোনদিন প্রত্যক্ষ রাজনীতি তো করিনি, তাই বুঝতে পারি না শিল্পীর কতটুকু রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে শেষপর্যন্ত সব ছেড়েছুড়ে দেন। অনেক টিকে থাকেন। আবার অনেকে শুধু ফায়দা তুলে পোজ নিয়ে বসে রইলেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতির কথা বুঝি না, এত দ্রুত ভোল বদলায়!' রাজনীতি সম্পর্কে রামকিঙ্করের এই মূল্যায়ন আজও যেমন প্রাসঙ্গিক, আগামীকালও থাকবে। রাজনীতির সেপ থিয়োরি রামকিঙ্কর তাঁর নিজের মতো করে বুঝেছিলেন। তাঁর বোঝার মধ্যে কোন ভুল ছিল না।

রামকিঙ্কর কিন্তু মনে করতেন শিল্পী হিসেবে সমাজের প্রতি কিছু - না - কিছু দায়বদ্ধতা সব শিল্পীরই থাকে। কারণ, শিল্পীও মানুষ এবং সামাজিক জীব। তার যেকোন শিল্পের বিষয়বস্তু মানুষ, মানুষের জাগতিক ও আত্মিক অনুভূতি। অতএব 'দাঙ্গা, দেশবিভাগ, মন্বন্তর, যুদ্ধ—যেখানে যত মানুষের প্রতি অপমান, শিল্পীকে আন্দোলিত করবেই।' তিনি মনে করেন : শিল্পের ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের তত্ত্ব শিল্পীর সৃজনশীলতার ক্ষতি করে। যে কোন মানুষের মস্তিষ্কে রয়েছে চিরকালীন ঐতিহ্যের সংগ্রহশালা। শিল্পের খেলায় হার - জিৎ বড় কথা নয়। খেলাটাই আসল। পূর্ণ আস্থা নিয়ে যে খেলতে পারে সেই শিল্পী।

যে কোন শিল্পের পেছনেই থাকে বড় আবেগ, অন্ধ আবেগ আর প্রেম। প্রেম ছাড়া শিল্প হয় না। যে কোন মানুষের জীবনে যেমন শিল্পীর জীবনেও ভালোবাসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে—সে ভালোবাসা মহান হতে পারে, ভয়াবহও হতে পারে, ভয়াবহ ধ্বংসাত্মকও হতে পারে। অবশ্য ভালোবাসার দৈহিক সংজ্ঞা তিনি বিশ্বাস করেন না। মৃত্যু পর্যন্ত সব শিল্পীর মনেই ভালোবাসার তৃষ্ণা থাকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্পীরা যেহেতু কোন রকম যৌনবিধি - নিষেধ ও মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে আক্রান্ত ছিলেন না। মহান সব শিল্পকর্ম সৃষ্টি করে যেতে পেরেছেন।

রামকিঙ্করের কাছে শিল্পের অর্থ রহস্যময়তা ও মায়া। শিল্প জীবনকে মূল্যবান করে তোলে। শিল্পের জগতে ভালো কাজ করতে পারলে মানুষ মনে রাখে।

রামকিঙ্কর বেইজ-এর আমি চাক্ষিক, রূপকার মাত্র রামকিঙ্করকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতায় দেখার একটি শোভনসুন্দর বই। বইটিতে নানা তল থেকে রামকিঙ্ককে দেখা যায় ও বোঝা যায়। জীবনের সহজপাঠ তিনি শুধু প্রকৃতির কাছ থেকে নেননি। আমরা যাদের 'জংলি' বা 'অসভ্য' মানুষ বলি তাদের কাছ থেকেও নিয়েছেন। রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শনশালার প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সমর ভৌমিককে লেখা পাঁচটি চিঠির একটিতে তিনি বলেছেন : 'পথ-ভালোবাসার তত্ত্ব আমার ওদের কাছে পাওয়া। আমি আগেও যেমন চলেছি, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সেই সহজ পথে থাকতে চাই। একটা কথা পথ চলতে চলতে, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সেই সহজ পথে থাকতে চাই। একটা কথা পথ চলতে চলতে বুঝেছি, পথে বড় কাঁকর। ঝোপঝাপড়া, কাঁটা আর নানা অজানা ভয়। একবার নির্ভর হতে পারলে এমন চলার আনন্দ আর কিছুতে নেই, সম্পূর্ণ এক অন্য পৃথিবীকে যেন কত কাছে পাওয়া যায়। স্বাধীন মন থাকলে তা থেকে বিচিত্র - সহজ রূপ, রস আস্বাদন করা যায়।

আমার শিল্পপ্রকৃতিতে ঐ স্বাধীন মূর্তিটা প্রবল বেশি।

মনফকিরা-র আন্তরিক যত্নে প্রকাশিত আমি চাক্ষিক রূপকার মাত্র শিল্পের ছটায় উদ্ভাসিত বই। বইটির সংকলন ও বিন্যাসে সন্দীপন ভট্টাচার্য। রামকিঙ্ককে বোঝার এ-রকম একটি শিল্পিত - বই প্রকাশ করে মনফকিরা শিল্প - সাহিত্য - চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের জগৎকে সমৃদ্ধ করলেন।